আল জুম'আ

৬২

নামকরণ

৯নং আয়াতের إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুম'আর নামাযের আহকাম বা বিধি–বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুম'আ সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মত এটিও এ সূরার প্রতিকী বা পরিচয়মূলক নাম।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরীতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসে থাকা অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু হুরাইরা সম্পর্কে এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুসারে ৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে আর ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে জমাদিউল উলা মাসে খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতএব যুক্তির দাবী হলো, ইহুদীদের এই সর্বশেষ দুর্গটি বিজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বোধন করে এ আয়াতগুলো নাযিল করে থাকবেন কিংবা খায়বারের পরিণাম দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী জনপদ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিল তখন হয়তো এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরাতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযির হয়েছিল। কেননা নবী (সা) মদীনা পৌছার পর পঞ্চম দিনেই জুম'আর নামায কায়েম করেছিলেন। এই রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুম'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দীনী উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব–কায়দা ও নিয়ম–কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে আমরা একথা বলেছি যে, এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। অতএব এর বিষয়বস্তু যেমন আলাদা তেমনি যাদের সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে সে লোকজনও আলাদা। তবে এ দু'টি রুকূ'র আয়াতসমূহের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য আছে

এবং এ জন্য তা একই সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাদৃশ্য কি তা বুঝার আগে রুকূ' দু'টির বিষয়বস্তু আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নেয়া উচিত।

ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার জন্য বিগত ছয় বছরে ইহুদীরা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এমনি এক সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। প্রথমত মদীনায় তাদের তিন তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা এর ফল দেখতে পেল এই যে, একটি গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল এবং অপর দু'টি গোত্রকে দেশান্তরিত হতে হলো। অতপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আরবের বহুসংখ্যক গোত্রকে মদীনার ওপর আক্রমণের জন্য নিয়ে আসল কিন্তু আহযাব যুদ্ধে তারা সবাই চপেটাঘাত খেল। এরপর তাদের সবচেয়ে বড় দুর্গ বা আখড়া রয়ে গিয়েছিল খায়বারে। মদীনা ত্যাগকারী ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাও সেখানে সমবেত হয়েছিল। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সেটিও অস্বাভাবিক রকমের কোন সংঘর্ষ ছাড়াই বিজিত হয় এবং মুসলমানদের ভূমি কর্ষণকারী হিসেবে থাকতে খোদ ইহুদীরাই আবেদন জানায়। সর্বশেষ এই পরাজয়ের পর আরবে ইহুদীদের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তায়মা, তাবুক সব একের পর এক আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ইসলামের অস্তিত্ব বরদাশত করা তো দূরের কথা, তার নাম শুনতেও যারা পছন্দ করত না, আরবের সেইসব ইহুদীই শেষ পর্যন্ত সেই ইসলামের প্রজায় পরিণত হয়। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে আরো একবার তাদেরকে সম্বোধন করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদে উল্লেখিত এটাই সম্ভবত সর্বশেষ বক্তব্য। এতে তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ তোমরা এ রসূলকে মানতে অস্বীকার করছো এই কারণে যে, তিনি এমন এক কওমের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে অবজ্ঞা ভরে তোমরা 'উম্মী' বলে থাক। তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, রসূলকে অবশ্যই তোমাদের নিজেদের কওমের মধ্যে থেকে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ছিলে যে, তোমাদের কওমের বাইরে যে ব্যক্তিই রিসালাতের দাবী করবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ এই পদমর্যাদা তোমাদের বংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং 'উম্মী'দের মধ্যে কখনো কোন রসূল আসতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের চোখের সামনেই যিনি তাঁর কিতাব শুনাচ্ছেন, মানুষকে পরিশুদ্ধ করছেন এবং সেই মানুষকে হিদায়াত দান করছেন তোমরা নিজেরাও যাদের গোমরাহীর অবস্থা জান। এটা আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর তোমাদের কোন ইজারাদারী নেই যে, তোমরা যাকে তা দেয়াতে চাও তাকেই তিনি দিবেন আর তোমরা যাকে বঞ্চিত করতে চাও তাকে তিনি বঞ্চিত করবেন।

দুই ঃ তোমাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এর গুরুদায়িত্ব উপলব্ধিও করনি, পালনও করনি। তোমাদের অবস্থা সেই গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে কিন্তু সে কি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তা জানে না। তোমাদের অবস্থা বরং ঐ গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। গাধার তো কোন প্রকার বুদ্ধি-বিবেক নেই, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে। তাছাড়া, তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক

হওয়ার গুরুদায়িত্ব শুধু এড়িয়েই চলছো না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা থেকেও বিরত থাকছো না। এসব সত্ত্বেও তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং রিসালাতের নিয়ামত চিরদিনের জন্য তোমাদের নামে লিখে দেয়া হয়েছে। তোমরা যেন মনে করে নিয়েছ, তোমরা আল্লাহর বাণীর হক আদায় করো আর না করো কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ছাড়া আর কাউকে তাঁর বাণীর বাহক বানাবেন না।

তিন ঃ সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে এবং এ বিশ্বাসও তোমাদের থাকতো যে, তাঁর কাছে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার স্থান সংরক্ষিত আছে তাহলে মৃত্যুর এমন ভীতি তোমাদের মধ্যে থাকতো না যে, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণীয় কিন্তু কোন অবস্থায়ই মৃত্যু গ্রহণীয় নয়। আর মৃত্যুর এই ভয়ের কারণেই তো বিগত কয়েক বছরে তোমরা পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছো। তোমাদের এই অবস্থা–ই প্রমাণ করে যে, তোমাদের অপকর্মসমূহ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবহিত। তোমাদের বিবেক ভাল করেই জানে যে, এসব অপকর্ম নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে পৃথিবীতে যতটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছো আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এ হচ্ছে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় রুকূ'টি এর কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো এ সূরার অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের 'সাবৃত' বা শনিবারের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে 'জুম'আ' দান করেছেন। তাই তিনি মুসলমানদের সাবধান করে দিতে চান যে, ইহুদীরা 'সাবৃতে'র সাথে যে আচরণ করেছে তারা যেন জুম'আর সাথে সেই আচরণ না করে। একদিন ঠিক জুম'আর নামাযের সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা আসলে তাদের ঢোল ও বাদ্যের শব্দ শুনে বারজন ছাড়া উপস্থিত সবাই মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে দৌড়িয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। তাই নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুম'আর আযান হওয়ার পর সব রকম কেনাবেচা এবং অন্য সব রকম ব্যস্ততা হারাম। ঈমানদারদের কাজ হলো, এ সময় সব কাজ বন্ধ রেখে আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হবে। তবে নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কারবার চালানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। জুম'আর হুকুম আহকাম সম্পর্কিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানান যেত কিংবা অন্য কোন সূরার অন্তরভুক্তও করা যেতে পারত। কিন্তু তা না করে এখানে যেসব আয়াতে ইহুদীদেরকে তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য তাই যা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾

আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১]

তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের[২] *মধ্যে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।*[৩] *অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।*[৪] *(এ রসূলের আগমন) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে যোগ দেয়নি।*[৫] *আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।*[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের ১ ও ২নং টীকা, আল হাশরের ৩৬, ৩৭ ও ৪১ টীকা। পরবর্তী বিষয়ের সাথে এই প্রারম্ভিক কথাটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আরবের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপে রিসালাতের স্পষ্ট নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্পর্কে তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা যে তাঁর ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শুধু এজন্য তাঁকে অস্বীকার করছিল যে, নিজ জাতি ও বংশের বাইরের আর কারো রিসালাত মেনে নেয়া তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দীয় ব্যাপার ছিল। তারা পরিষ্কার বলতো, আমাদের কাছে যাকিছু এসেছে আমরা কেবল তাই মানব। কোনো অইসরাঈলী নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোনো শিক্ষা এসে থাকলে তা মেনে নিতে তারা আদৌ প্রস্তুতি ছিল না। এই আচরণের কারণে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে। তাই এই

প্রারম্ভিক আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এতে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর তাসবীহ করছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, যেসব অপূর্ণতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ইহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম ও বদ্ধমূল করে রেখেছে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো আত্মীয় নন। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্বমূলক (Favouritism) কোনো কাজ নেই। তিনি নিজের সমস্ত সৃষ্টির সাথে সমানভাবে ইনসাফ, রহমত ও প্রতিপালক সুলভ আচরণ করেন। কোনো বিশেষ বংশধারা বা কওম তাঁর প্রিয় পাত্র নয় যে, তারা যাই করুক না কেন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠী বা কওমের সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই যে, তাদের মধ্যে সদগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দান ও করুণা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এরপর বলা হয়েছে, তিনি বাদশাহ। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের কোনো শক্তিই তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সীমিত করতে পারে না। তোমরা তাঁর দাস এবং প্রজা। তোমাদের হিদায়াতের জন্য তিনি কাকে পয়গাম্বর বানাবেন আর কাকে বানাবেন না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত পদমর্যাদা তোমরা কবে থেকে লাভ করেছ? তারপর বলা হয়েছে, তিনি قدوس বা মহাপবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক উর্ধে। তোমাদের বুঝ ও উপলব্ধিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে না। শেষ দিকে আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। অপরটি হলো তিনি জ্ঞানময়, অর্থাৎ যাকিছু করেন বুদ্ধি, বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবীও হুবহু তাই। আর তাঁর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা এতই সুদৃঢ় হয়ে থাকে যে, বিশ্ব-জাহানের কেউই তা ব্যর্থ করতে পারে না।

২. এখানে 'উম্মী' শব্দটি ইহুদীদের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বা তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ইহুদীরা যাদেরকে অবজ্ঞা করে 'উম্মী' বলে থাকে এবং নিজেদের তুলনায় নগণ্য ও নীচু বলে মনে করে পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তাদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে রসূল হয়ে বসেননি, বরং তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিই যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে এরা আদৌ সক্ষম নয়।

জেনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদে 'উম্মী' শব্দটি বেশ কটি স্থানে এসেছে। তবে সব জায়গায় শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও যাদের কাছে অনুসরণ করার জন্য কোনো আসমানী কিতাব নেই আহলে কিতাবদের বিপরীতে তাদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ -(ال عمران : ٢٠)

"আহলে কিতাব ও উম্মীদের জিজ্ঞেস কর ঃ তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ?"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০)

এখানে উম্মী বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে এবং তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোথাও এ শব্দটি আহলে কিতাবদেরই নিরক্ষর ও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত লোকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ اِلَّا أَمَانِيَّ -(البقرة : ٧٨)

"এই ইহুদীদের কিছু লোক আছে 'উম্মী' কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের নেই। তারা কেবল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকেই চিনে।"–(সূরা বাকারা ঃ ৭৮)

আবার কোথাও এ শব্দটি নিরেট ইহুদী পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'উম্মী' বলতে অ-ইহুদী সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

যেমন, বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّنَ سَبِيْلٌ -(ال عمران : ٧٥)

"তাদের মধ্যে এ অসাধুতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, তারা বলে ঃ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ লুটেপুটে ও মেরে খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫)

আলোচ্য আয়াতে এই তৃতীয় অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটি ইব্রিয় ভাষার "গোয়েম" শব্দের সমার্থক। ইংরেজী বাইবেলে এর অনুবাদ করা হয়েছে Gentiles এবং এর দ্বারা সমস্ত অ-ইহুদী বা অ-ইসরাঈলী লোককে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু শুধু এতটুকু ব্যাখ্যার সাহায্যে এ ইহুদী পরিভাষাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা সম্ভব নয়। ইবরানী বা ইব্রিয় ভাষায় 'গোয়েম' শব্দটি প্রথমত কেবল জাতি বা কওমসমূহ অর্থে বলা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহুদীরা এটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমে তারা এটিকে নিজেদের ছাড়া অন্যসব কওমের জন্য নির্দিষ্ট করে। পরে এ শব্দটির অর্থে এ ভাবধারাও সৃষ্টি করে যে, ইহুদীরা ছাড়া অন্য সব জাতিই অসভ্য ও অভদ্র, ধর্মের দিক থেকে নিকৃষ্ট, অপবিত্র এবং নীচ ও হীন। শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ শব্দটি একই উদ্দেশ্যে অগ্রীকদের জন্য গ্রীকদের ব্যবহৃত পরিভাষা Barbarian শব্দটিকেও ছাড়িয়ে যায়। রিব্বীদের সাহিত্যে 'গোয়েম'রা এমনই ঘৃণ্য মানুষ যে, তাদেরকে মানুষ হিসাবে ভাই বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং তাদের সাথে সফরও করা যেতে পারে না। বরং তাদের কেউ যদি পানিতে ডুবে মরতে থাকে তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টাও করা যেতে পারে না। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, মাসীহ এসে সমস্ত গোয়েমকে ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবেন।–(আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান, টীকা ৬৪)।

৩. কুরআন মজীদের চারটি স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই বর্ণনা করার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে

আরববাসীদের একথা বলার জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আসাকে তারা যে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বলে মনে করছে, তা ঠিক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এটি লাভের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। সূরা বাকারার ১৫১ আয়াতে এসব গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন নবীর (সা) মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী বানানোর মাধ্যমে যে নিয়ামত তাঁদের দিয়েছেন তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াতে আবার এসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মানুষগুলোকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাঁর রসূল পাঠিয়ে কত বড় ইহসান করেছেন। কিন্তু তারা এমনই অপদার্থ যে, তাঁকে কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না। চতুর্থবারের মত এ সূরাতে ঐসব গুণাবলী পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ইহুদীদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের চোখের সামনে যেসব কাজ করেছেন তা স্পষ্টত একজন রসূলের কাজ। তিনি আল্লাহর আয়াত শুনাচ্ছেন। এসব আয়াতের ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর আয়াত। তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং লেনদেন ও জীবনাচরণকে সব রকমের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র করছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করছে। এটা ঠিক সেই কাজ যা ইতিপূর্বে সমস্ত নবী-রসূলও করেছেন। তাছাড়া তিনি শুধু আয়াতসমূহ শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করেন না, বরং সবসময় নিজের কথা ও কাজ দ্বারা নিজের বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছেন। তিনি তাদের এমন যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন যা কেবল নবী-রসূলগণ ছাড়া আর কেউ-ই শিক্ষা দেয়নি। এ ধরনের চরিত্র ও কাজ নবী-রসূলদের বিশেষ বৈশিষ্ট ও গুণ। এর সাহায্যেই তাঁদের চেনা যায়। সত্যিকার অর্থে নিজের কর্মকাণ্ড থেকে যার রসূল হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে তোমরা কেবল এজন্য অস্বীকার করছো যে, তাঁকে তোমাদের কওমের মধ্য থেকে না পাঠিয়ে এমন এক কওমের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে যাদেরকে তোমরা 'উম্মী' বলে অবজ্ঞা করে থাকো।

৪. এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের আরো একটি প্রমাণ। ইহুদীদের সত্যোপলব্ধির জন্য এ প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে। তারা শত শত বছর পূর্ব থেকে আরব ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। আরবের অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং তামাদ্দুনিক জীবনের কোনো দিকই তাদের অজানা ছিল না। তাদের পূর্বতন এ অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এ জাতির চেহারা যেভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব লোক যে অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিল তা তোমাদের জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের অবস্থা কি হয়েছে তাও তোমরা নিজ চোখে দেখছ। আর এ জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একজন অন্ধও এই স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে ও বুঝতে পারে। এটা কি তোমাদেরকে একথা বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে, একজন নবী ছাড়া এটা আর কারো কীর্তি হতে পারে না ? বরং এর তুলনায় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের কীর্তিও ম্লান হয়ে গিয়েছে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ④ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

এটা তাঁর মেহেরবানী, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহাকরুণার অধিকারী।

যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি[৭] তাদের উপমা সেইসব গাধা[৮] যা বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেইসব লোকের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে।[৯] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দান করেন না।

৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত শুধু আরব জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা দুনিয়ার সেইসব জাতি ও বংশ-গোষ্ঠীর জন্য যারা এখনো ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়নি, বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। মূল আয়াতাংশ হলো ঃ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ তাদের মধ্য থেকে আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদের সাথে শামিল হয়নি। এ আয়াতের مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেই অন্যান্য লোকগুলো উম্মীদের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ তারা হবে দুনিয়ার অ-ইসরাঈলী জাতি-গোষ্ঠীর লোক। দুই, তারা হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণকারী। তবে এখনো ঈমানদারদের মধ্যে অন্তরভুক্ত হয়নি, কিন্তু পরে এসে শামিল হবে। এভাবে এ আয়াতটিও সেই সব আয়াতের অন্তরভুক্ত যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরদিনের জন্য। কুরআন মজীদের আর যেসব স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাহলো সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৯, আল আরাফ ১৫৮, আল আম্বিয়া ১০৭, আল ফুরকান ১, সাবা ২৮ ; (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৪৭)।

৬. অর্থাৎ এটি তাঁর শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক যে, তিনি এ ধরনের এক অশিষ্ট উম্মী কওমের মধ্য থেকে এমন মহান নবী সৃষ্টি করেছেন যাঁর শিক্ষা ও হিদায়াত এতটা বিপ্লবাত্মক ও এমন বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার ধারক, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানব জাতি একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং এ নীতিমালা থেকে চিরদিন দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই এই স্থান ও মর্যাদা লাভ করতে পারতো না। আরবদের মত

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ
فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ
فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

তুমি বল, হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ![১০] তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, অন্য সব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র,[১১] আর তোমাদের এ ধারণার ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো,[১২] তাহলে মৃত্যু চেয়ে নাও। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে[১৩] তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এসব জালেমকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

পশ্চাদপদ জাতি তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন বড় জাতির সর্বাধিক মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিও এভাবে কোন জাতির চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে এবং গোটা মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য একটি আদর্শ এবং একটি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ও সর্বাত্মক আদর্শ পরিচালনার যোগ্য হওয়ার মত একটা ব্যাপক নীতিমালা গোটা বিশ্বকে উপহার দিতে পারতো না। এটি আল্লাহর কুদরাতে সংঘটিত একটি মু'জিযা। আল্লাহ তাঁর কৌশল অনুসারে যে ব্যক্তি, যে দেশ এবং যে জাতিকে চেয়েছেন এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। এতে কোন নির্বোধ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পেতে থাকুক।

৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তাঁর সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি।

৮. অর্থাৎ গাধার পিঠে বই-পুস্তকের বোঝা চাপানো থাকলেও পিঠের ওপর কি আছে সে যেমন তা জানে না। অনুরূপ এই তাওরাতের বোঝাও তাদের ওপর চাপানো আছে। কিন্তু তারা আদৌ জানে না, এই মহান গ্রন্থ কি জন্য এসেছে এবং তাদের কাছে কি দাবী করছে।

৯. অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধার চেয়েও নিকৃষ্টতর। গাধার কোন বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি নেই বলে সে অক্ষম, কিন্তু এদের তো বিবেক-বুদ্ধি ও উপলব্ধি আছে। এরা নিজেরা তাওরাত পড়ে এবং অন্যদের পড়ায় তাই এর অর্থ তাদের অজানা নয়। এরপরও তারা জেনে শুনে এর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ও উপেক্ষা করছে এবং সেই নবীকে মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে যিনি তাওরাত অনুসারে অবিসম্বাদিতভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা জানে না বা বুঝে না বলে দোষী নয়, বরং জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী।

১০. এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এখানে "হে ইহুদীরা" বলা হয়নি। বলা হয়েছে "হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ" অথবা "যারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছো"। এর কারণ হলো, মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবী-রসূলগণ আসল যে দীন এনেছিলেন তা ছিল ইসলাম। এসব নবী-রসূলদের কেউই ইহুদী ছিলেন না এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীবাদের সৃষ্টিও হয়েছিল না। এই নামে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বহু পরে। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশোদ্ভূত গোত্রটির নামানুসারে এ ধর্মের নামকরণ হয়েছে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের পরে তাঁর সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই গোত্রটি ইয়াহুদিয়া নামক রাষ্ট্রটির মালিক হয় এবং বনী ইসরাঈলের অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে যা সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে আসিরীয়রা সামেরিয়াকে শুধু ধ্বংসই করেনি, বরং এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রগুলোর নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। এরপরে শুধু ইয়াহুদা এবং তার সাথে বিন ইয়ামীনের বংশ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তার ওপর ইয়াহুদা বংশের প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে তাদের জন্য ইয়াহুদ শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। ইহুদী ধর্মযাজক, রিব্বী এবং আহবাররা নিজেদের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী এই বংশের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের যে কাঠামো শত শত বছর ধরে নির্মাণ করেছে তার নাম ইহুদীবাদ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই কাঠামো নির্মাণ শুরু হয় এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চলতে থাকে। আল্লাহর রসূলদের আনীত আল্লাহর হিদায়াতের উপাদান খুব সামান্যই এতে আছে এবং যা আছে তার চেহারাও অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। এ কারণে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে তাদেরকে الَّذِينَ هَادُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সব লোক যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছে বা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যকার সবাই আবার ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অইসরাঈলী ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছিল তারাও এর মধ্যে ছিল। কুরআন মজীদে যেখানে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে "হে বনী ইসরাঈল" বলা হয়েছে। আর যেখানে ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে الَّذِينَ هَادُوا বলা হয়েছে।

১১. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ তারা বলেন, ইহুদীরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না (আল বাকারাহ, ১১১)। দোযখের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে (আল বাকারাহ, ৮০; আলে ইমরান, ২৪)। আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র (আল মায়েদা, ১৮)। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও এ ধরনের কিছু দাবী–দাওয়া দেখা যায়। সারা বিশ্ব অন্তত এতটুকু কথা জানে যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা সৃষ্টি (Chosen People) বলে থাকে। তারা এরূপ এক খোশ খেয়ালে মত্ত যে, তাদের সাথে খোদার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর সংগে নেই।

১২. এখানে কুরআন মজীদে একথাটি দ্বিতীয়বারের মত ইহুদীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। প্রথমে সূরা বাকারায় বলা হয়েছিল, এদের বলো, আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষকে বাদ দিয়ে আখেরাতের ঘর যদি কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থেকে থাকে আর এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে মৃত্যু কামনা করো। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের খুব ভাল করেই জানেন। বরং তোমরা দেখবে তারা কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকতে সমস্ত মানুষের চেয়ে এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লালায়িত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আকাংখা করে হাজার বছর বেঁচে থাকার। অথচ দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেও তা তাদেরকে এই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের সমস্ত কৃতকর্মই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে (আয়াত ৯৪—৯৬)। এ কথাটিই এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা শুধু পুনরুক্তিই নয়। সূরা বাকারার আয়াতগুলোতে একথা বলা হয়েছিল তখন, যখন ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই সূরায় তার পুনরুক্তি করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তাদের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আরবভূমিতে চূড়ান্তভাবে তাদের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে। পূর্বে সূরা বাকারায় যে কথা বলা হয়েছিল এসব যুদ্ধ এবং তাদের পরিণাম অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দুই ভাবেই তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। মদীনা এবং খায়বারে সংখ্যার দিক দিয়ে ইহুদী শক্তি কোনভাবেই মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না এবং উপায়–উপকরণও তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া আরবের মুশরিকরা এবং মদীনার মুনাফিকরাও তাদের সাহায্য–সহযোগিতা করছিল। কারণ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু এই অসম মোকাবিলায় যে জিনিসটি মুসলমানদের বিজয়ী এবং ইহুদীদের পরাজিত করেছিল তা ছিল এই যে, মুসলমানগণ আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা বরং হৃদয়ের গভীর থেকে মৃত্যু কামনা করতো এবং মরণ পণ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। আর এ বিষয়েও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীর জন্য রয়েছে জান্নাত। অপরদিকে ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা কোন পথেই জান দিতে প্রস্তুত ছিল না; না খোদার পথে, না নিজের কওমের পথে এবং না নিজের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার পথে। যে ধরনের জীবনই হোক না কেন তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল বেঁচে থাকার। এ জিনিসটিই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছিল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ
ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

২ রুকূ'

হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুম'আর দিন[১৪] *যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।*[১৫] *এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো*[১৬] *এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো।*[১৭] *আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।*[১৮]

১৩. অন্য কথায় মৃত্যু থেকে তাদের এই পালানো বিনা কারণে নয়। মুখে তারা যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, আল্লাহর দীনের সাথে তারা যে আচরণ করেছে এবং পৃথিবীতে তারা যা করছে আখেরাতে সেই সব আচরণ ও কাজকর্মের কিরূপ ফলাফল আশা করা যায় তাদের জ্ঞান ও বিবেক তা ভাল করেই জানতো। এ কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর আদালতের মুখোমুখি হতে টালবাহানা করে।

১৪. এ আয়াতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। প্রথমটি হলো, এতে নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, এমন একটি নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা আছে যা বিশেষভাবে শুধু জুমআর দিনেই পড়তে হবে। তৃতীয়টি হলো, এ দু'টি জিনিসের কথা এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো এবং জুমআর দিনে একটি বিশেষ নামায পড়। বরং বর্ণনাভঙ্গি ও পূর্বাপর বর্ণনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নামাযের ঘোষণা এবং জুমআর দিনের বিশেষ নামায উভয়টিই আগে থেকেই চালু ছিল। তবে মানুষ ভুল করতো এই যে, জুমাআর নামাযের ঘোষণা শুনেও তারা নামাযের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে গাফলতি করতো এবং কেনাবেচার কাজেই ব্যস্ত থাকতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি শুধু এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন যে, মানুষ এই ঘোষণা এবং এই বিশেষ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করুক এবং ফরয মনে করে এ উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হোক। এ তিনটি বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে তা থেকে এই মৌলিক বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু নির্দেশও দিতেন যা কুরআনের মধ্যে নেই। কিন্তু সেই সব নির্দেশ ও কুরআনের নির্দেশাবলীর মত অবশ্য পালনীয় ছিল। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার যে আযান দেয়া

হয় সেই আযানই নামাযের জন্য ঘোষণা। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন স্থানে না এ আযানের ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে, না মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযের জন্য এভাবে আহবান জানাও। এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত জিনিস। কুরআন মজীদে শুধু দু'টি স্থানে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। প্রথমত এই আয়াতে। দ্বিতীয়ত সূরা মায়েদার ৫৮ আয়াতে। অনুরূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ যে জুম'আর নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদে তারও কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং পড়ার সময় ও নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়নি। এ নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চালু করা। কুরআনের এ আয়াতটি শুধু এর গুরুত্ব এবং অলংঘনীয়ভাবে পালন করার বিষয়টি বুঝানোর জন্যই নাযিল হয়েছে। স্পষ্ট এই দলীল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে, শুধু কুরআনে বর্ণিত হুকুম-আহকামই শরয়ী হুকুম-আহকাম—সে প্রকৃতপক্ষে শুধু সুন্নাতকেই অস্বীকার করে না, কুরআনকেও অস্বীকার করে।

এ বিষয়ে আরো বক্তব্য পেশ করার পূর্বে জুম'আ সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিষয়ও জেনে নেয়া দরকার।

জুম'আ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগে আরবের অধিবাসীরা একে 'ইয়াওমে আরূবা' বলত। ইসলামী যুগে এ দিনটিকে মুসলমানদের সমাবেশের দিন হিসেবে নির্ধারিত করে এর নাম দেয়া হয় জুম'আ। ঐতিহাসিকগণ যদিও বলেন যে, কা'ব ইবনে লুয়াই কিংবা কুসাই ইবনে কিলাবও এদিনটির জন্য এ নাম ব্যবহার করেছিল। কারণ এ দিনেই তারা কুরাইশদের লোকজনের সমাবেশ করতেন (ফাতহুল বারী)। কিন্তু তার এই কাজ দ্বারা প্রাচীন এই নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং সাধারণ আরববাসী এ দিনটিকে 'আরূবা'ই বলত। সত্যিকার অর্থে নামের পরিবর্তন হয় তখন যখন ইসলামী যুগে এর নতুন নাম রাখা হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে সপ্তাহে একটি দিনকে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তাকে জাতির প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করার রীতি আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রচিলিত ছিল। ইহুদীরা ঐ উদ্দেশ্যে 'সাব্‌তে'র (শনিবার) দিনটিকে নির্ধারিত করেছিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ দিনেই বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। খৃস্টানরা নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য রবিবার দিনকে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করে। যদিও এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা দিয়েছিলেন না ইনজীল তথা বাইবেলে এর কোন উল্লেখ আছে। তবে খৃস্টানদের বিশ্বাস হলো ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার পর এ দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কবর থেকে বেরিয়ে আসমানের দিকে গিয়ে ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালের খৃস্টানরা এ দিনটিকে তাদের উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর ৩২১ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য একটি নির্দেশের দ্বারা এ দিনটিকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। এ দু'টি জাতি থেকে নিজ জাতিকে আলাদা করার জন্য ইসলাম এ দু'টি দিন বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে সামষ্টিক ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ওপর জুম'আ ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় তিনি এ নির্দেশের ওপর আমল করতে পারতেন না। কারণ মক্কায় সামষ্টিক কোন ইবাদাত করা সম্ভব ছিল না। তাই যেসব লোক নবীর (সা) আগে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন সেখানে জুম'আ কায়েম করে। অতএব প্রথম দিকে হিজরাতকারীদের নেতা হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুম'আর নামায আদায় করেন। (তাবারানী, দারু কুতনী)। হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং ইবনে সিরীনের বর্ণনা মতে এরও পূর্বে আনসারগণ আপনা থেকেই (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পৌছার পূর্বে) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সবাই মিলে সপ্তাহে একদিন সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাব্‌ত এবং খৃষ্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে মনোনীত করেছিলেন এবং বনী বায়দা এলাকায় হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা প্রথম জুম'আ পড়েছিলেন। এতে ৪০ ব্যক্তি শরীক হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী)। এ থেকে জানা যায় ইসলামী জনতার আবেগ অনুভূতি তখন এমন একটি দিন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল যেদিন অধিক সংখ্যক মুসলমান একত্র হয়ে সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবে। তা শনিবার ও রবিবার থেকে আলাদা কোন দিন হওয়াটাও ইসলামী রুচি ও মেজাজ–প্রকৃতিরই দাবী ছিল। যাতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতীয় প্রতীক থেকে আলাদা থাকে। এটা সাহাবা কিরামের ইসলামী মানসিকতার একটি বিস্ময়কর কীর্তি। অনেক সময় নির্দেশ আসার পূর্বে তাদের এই রুচি ও মেজাজ–প্রকৃতিই বলে দিতো যে, ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতি অমুক জিনিসের দাবী করছে।

হিজরাত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন জুম'আর নামায কায়েম করা তার অন্যতম। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরাত করে সোমবার দিন তিনি কুবায় উপনীত হন, চারদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং পঞ্চম দিন জুম'আর দিনে সেখান থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনী সালেম ইবনে আওফের এলাকায় জুম'আর নামাযের সময় হয়। সেখানেই তিনি প্রথম জুম'আর নামায পড়েন। (ইবনে হিশাম)

এ নামাযের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পরের সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন অর্থাৎ ঠিক যোহরের নামাযের সময়। হিজরাতের পূর্বে হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তিনি যে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

فَاِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِرَكْعَتَيْنِ - (دار قطنى)

"জুম'আর দিন সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে তখন দুই রাকআত নামাযের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর।" (দারু কুতনী)

হিজরাতের পরে তিনি মৌখিকভাবেও এ নির্দেশ দিয়েছেন এবং কার্যতও ঐ সময়ে জুম'আর নামায পড়াতেন। হযরত আনাস (রা) হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা),

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), হযরত সাহল (রা) ইবনে সা'দ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির এবং হযরত বেলাল (রা) থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ঐ সব বর্ণনায় আছে সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার পর নবী (সা) জুম'আর নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)।

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ–কর্ম থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, জুম'আর দিন তিনি যোহরের নামাযের পরিবর্তে জুম'আর নামায পড়াতেন। এ নামায ছিল মাত্র দু' রাকআত। নামাযের আগে তিনি খুতবা দিতেন। এটা ছিল জুম'আর নামায এবং অন্যান্য দিনের যোহরের নামাযের মধ্যে পার্থক্যসূচক। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ

صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لاَجْلِ الْخُطْبَةِ –

(احكام القران للجصاص)

"তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃতবাণী অনুসারে মুসাফিরের নামায দুই রাকআত, ফজরের নামায দু' রাকআত এবং জুম'আর নামায দুই রাকআত। এটা কসর নয়, বরং পূর্ণ নামায। আর খোতবা থাকার কারণে জুম'আর নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।"

এখানে যে আযানের উল্লেখ করা হয়েছে তা খোতবার বেশ আগে যে আযানের মাধ্যমে মানুষকে জুম'আর নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার বিষয়টি অবগত করা হয় সে আযান নয়, বরং খোতবার ঠিক আগে যে আযান দেয়া হয় সেই আযান। হযরত সায়েব (রা) ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাসের যুগে শুধু একটি আযান দেয়া হতো। আর তা দেয়া হতো ইমাম মিম্বরে উঠে বসার পর। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) যুগেও এ কাজটিই করা হয়েছে। অতপর হযরত উসমানের (রা) সময়ে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে তিনি আরো একটি আযান দেয়ানো শুরু করেন। মদীনার বাজারে অবস্থিত তাঁর যাওরা নামক বাড়ীতে এ আযান দেয়া হতো। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, তাবারানী)

১৫. এই নির্দেশের মধ্যে উল্লেখিত (যিক্‌র) শব্দের অর্থ হচ্ছে খোত্‌বা। কারণ, আযানের পরে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে কাজটি করতেন তা ছিল খোতবা। তিনি সবসময় খোতবার পরে নামায পড়তেন। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জুম'আর ফেরেশতাগণ নামাযের জন্য আগমনকারী ব্যক্তির নাম তাদের আগমনের পরম্পরা অনুসারে লিখতে থাকেন। অতপর اذا خرج الامام حضرت الملئكة يستمعون الذكر

ইমাম যখন খোতবার জন্য দাঁড়ান তখন তাঁর নাম লেখা বন্ধ করে দেন এবং যিকর (অর্থাৎ খোতবা) শুনতে মনোনিবেশ করেন" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যিকর অর্থ খোতবা। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও এ অর্থের ইংগিত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে বলা হয়েছেঃ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ "আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।" পরে বলা হয়েছে ঃ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ "তারপর নামায শেষ হয়ে গেলে ভূ–পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো।" এ থেকে জুম'আর দিনের কাজের যে পরম্পরা বুঝা যায় তা হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহর যিকির এবং তারপর নামায। মুফাস্‌সিরগণও এ বিষয়ে একমত যে, যিকির অর্থ হয় খোতবা, নয়তো খোতবা ও নামায উভয়টিই।

খোতবার জন্য ذِكْرُ اللّٰهِ (যিকরুল্লাহ—আল্লাহর যিকির) শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, খোতবার মধ্যে এমন সব বিষয় থাকতে হবে যা আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন ঃ আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা, তাঁর রসূলের প্রতি দরুদ ও সালাত, তাঁর হুকুম আহকাম, তাঁর শরীয়াত অনুসারে আমলের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তাঁকে ভয় করেন এমন সব নেক বান্দাদের প্রশংসা ইত্যাদি। এ কারণে যামাখশারী কাশ্‌শাফে লিখেছেন যে, খোতবায় জালেম শাসকদের তারিফ ও প্রশংসা করা কিংবা তাদের নামোল্লেখ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার "যিক্‌রুল্লাহ"র সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং তা "যিকরুশ্‌ শাইতান"—শয়তানের যিকির হিসেবে পরিগণিত।

'আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও' অর্থ 'দৌড়িয়ে আস' নয়। বরং এর অর্থ হলো, তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছার চেষ্টা করো। আমাদের ভাষায়ও আমরা এ ধরনের অনেক কথা বলে থাকি। এসব কথার অর্থ হয়ে থাকে তৎপরতা দেখানো। দৌড়ানো অর্থে তা ব্যবহার করা হয় না। অনুরূপ আরবীতেও سعى শব্দ দ্বারা শুধু দৌড়ানোই বুঝায় না। কুরআনের অধিকাংশ স্থানে سعى শব্দটি প্রচেষ্টা চালানো এবং চেষ্টা–সাধনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى – وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا –

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ – وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا –

মুফাস্‌সিরগণও সর্বসম্মতভাবে এ শব্দটিকে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে سعى অর্থ হলো, আযান শোনার পর মানুষ অবিলম্বে মসজিদে পৌছার চিন্তা করতে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয়, বরং নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামায শুরু হলে ধীরে সুস্থে ও স্থিরচিত্তে গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য অগ্রসর হও, দৌড়িয়ে শরীক হয়ো না। এভাবে অগ্রসর হয়ে যতটা নামায পাবে তাতে শরীক হবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা পরে পূরণ করে নেবে। (সিহাহ সিত্তাহ) হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) বলেন ঃ একবার আমরা নবীর (সা) সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমরা লোকজনের দৌড়াদৌড়ি করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। নামায শেষ করে নবী (সা) ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস

করলেন, এসব কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বলল ঃ নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখনই নামাযে আসবে শান্তভাবে ও স্থিরচিত্তে আসবে। এভাবে ইমামের সাথে যতটা নামায পাওয়া যাবে পড়বে। আর যে অংশ ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে। (বুখারী, মুসলিম)।

'কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো' কথাটার অর্থ শুধু কেনা-বেচাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করা। বিশেষভাবে বেচা-কেনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, জুম'আর দিন ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জমে উঠতো। এই দিন আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌছত। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেবল কেনা-বেচা পর্যন্তই সীমিত নয়, অন্যান্য সব ব্যস্ততাও এর অন্তরভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুম'আর আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সবরকমের কাজ কারবার হারাম।

এই নির্দেশটি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে জুম'আর নামায ফরয। প্রথমত আযান শোনামাত্র জুম'আর নামাযের জন্য যাওয়ার তাগাদাই তার প্রমাণ। তাছাড়া জুম'আর নামাযের জন্য কেনা-বেচার মত একটা হালাল কাজ হারাম হয়ে যাওয়াও এর ফরয হওয়া প্রমাণ করে। উপরন্তু জুম'আর দিন যোহরের ফরয নামায রহিত হয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে জুম'আর নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এর ফরয হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, কোন ফরয কেবল তখনই রহিত হয় যখন তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন ফরয তার স্থান পূরণ করে। বহু সংখ্যক হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামাযের জন্য কঠোরভাবে তাকীদ করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মন চায়, অন্য কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াতে দাঁড় করিয়ে দেই এবং নিজে গিয়ে সেসব লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুম'আর নামায পড়তে আসে না (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা জুম'আর খোতবায় নবীকে (সা) একথা বলতে শুনেছি ঃ মানুষের জুম'আর নামায পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের মনের ওপর মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিল হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী)। হযরত আবুল জা'দ (রা) দামরী, হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আবী আওফার বর্ণিত হাদীসসমূহে নবীর (সা) যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, "যে ব্যক্তি প্রকৃত কোন কারণ ও সংগত ওযর ছাড়া শুধু বে-পরোয়া মানসিকতার কারণে পরপর তিনটি জুম'আ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার দিলের ওপর মোহর মেরে দেন। বরং একটি হাদীসে তো এতদূর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার দিলকে মুনাফিকের দিল বানিয়ে দেন" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী,

হাকেম, ইবনে হিব্বান, বায্যার, তাবারানী ফিল কাবীর) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আজ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। যে ব্যক্তি তাকে মামুলি ব্যাপার মনে করে এবং তার গুরুত্ব স্বীকার না করে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ যেন তার অবস্থা ভাল না করেন এবং তাকে কোন প্রকার বরকতও না দেন। কান পেতে শুনে নাও যতক্ষণ সে তাওবা না করবে তার নামায নামায নয়, তার যাকাত যাকাত নয়, তার হজ্জ হজ্জ নয়, তার রোযা রোযা নয়, তার কোন নেক কাজ নেক কাজ নয়। অতপর যে তাওবা করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমাকারী।" (ইবনে মাজা, বায্যার) প্রায় একই অর্থের একটি হাদীস তাবারানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক হাদীসে নবী (সা) স্পষ্ট ভাষায় জুম'আর নামাযকে ফরয এবং অবশ্য পালনীয় হক বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ইবনে আস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আযান শুনতে পায় জুম'আর নামায তাদের ওপরই ফরয (আবু দাউদ, দারুকুতনী)। জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ "জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয করেছেন" (বায়হাকী)। তবে তিনি নারী, শিশু, ক্রীতদাস, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরকে এ ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। হযরত হাফসা বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "জুম'আর নামাযের জন্য বের হওয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব" (নাসায়ী)। হযরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া জামায়াতের সাথে জুম'আ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব (আবু দাউদ ও হাকেম)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) ভাষ্য হলো ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার ওপরে জুম'আ ফরয। তবে নারী, মুসাফির, ক্রীতদাস বা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ফরয নয় (দারু কুতনী, বায়হাকী)। কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে জুম'আর নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১৬. একথার অর্থ এ নয় যে, জুম'আর নামায পড়ার পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বা রিযিকের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠা জরুরী। বরং এ নির্দেশ থেকে শুধু এ কাজ করার অনুমতি বুঝায়। যেহেতু জুম'আর আযান শোনার পর সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং যে কাজ–কর্ম করতে চাও তা করার অনুমতি তোমাদের জন্য আছে। এটা ঠিক ইহ্রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করার পর فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا "যখন ইহ্রাম খুলবে তখন শিকার করো" (আল মায়েদাহ, ৩) বলার মত। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, ইহ্রাম খোলার পর অব্যশই শিকার করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, ইহ্রাম খোলার পর শিকার করার ব্যাপারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। কিংবা সূরা নিসাতে যেমন فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতাংশে একাধিক বিয়ে করার অনুমিত দেয়া হয়েছে। এখানে যদিও নির্দেশসূচক শব্দ فَانْكِحُوا ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কেউ–ই একে নির্দেশ অর্থে গ্রহণ করেননি। এর থেকে মৌলিক একটি মাসয়ালার তথা সূত্র পাওয়া যায় যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা সবসময় কোন জিনিস ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় বলে

প্রমাণিত হয় না। বরং তা কখনো অনুমতি আবার কখনো কোন জিনিসকে তুলনামূলকভাবে বেশী পছন্দ করা অর্থ বুঝায়। এ ক্ষেত্রে কোথায় তা আদেশ অর্থে, কোথায় অনুমতি অর্থে এবং কোথায় আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়টি আগের ও পরের প্রসংগ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে কাজটি ফরয বা ওয়াজিব সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ আয়াতাংশের ঠিক পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا "আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো।" এখানেও আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ শব্দ ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় অর্থ প্রকাশ করছে না, বরং "পছন্দনীয় হওয়া" অর্থ প্রকাশ করছে। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, কুরআনে যদিও ইহুদীদের সাব্‌ত এবং খৃষ্টানদের রোববারের মত জুম'আর দিনকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু একথা কেউ–ই অস্বীকার করতে পারে না যে, শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতির প্রতীক জুম'আও ঠিক তেমনি মুসলমানদের জাতির প্রতীক। সুতরাং তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যদি সপ্তাহের কোন দিনকে সাধারণ ছুটির জন্য মনোনীত করতে হয় তাহলে ইহুদীরা যেমন স্বাভাবিকভাবে শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা রোববারকে বেছে নিয়েছে তেমনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানরাও (যদি তাদের মন–মানস ও স্বভাব প্রকৃতিতে লেশমাত্র ইসলামী অনুভূতি বিদ্যমান থেকে থাকে) জুম'আর দিনকেই বেছে নেবে। খৃষ্টানরা তো তাদের নিজের দেশ ছাড়া এমনসব দেশের ওপরও তাদের রোববার চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। যেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের ইসরাঈলী রাষ্ট্র কায়েম করলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে রোববারের পরিবর্তে শনিবারকে ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত করা। বিভাগ পূর্ব ভারতে বৃটিশ ভারত এবং মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নজরে পড়ত তাহচ্ছে দেশের এক অংশে রোববারে সাপ্তাহিক ছুটি হতো এবং অন্য অংশে জুম'আর দিনে ছুটি হতো। তবে যেসব জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি ও ভাবধারা বর্তমান থাকত না সেখানে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসার পরও তারা রোববারকেই বুকে জড়িয়ে রাখে যা আমরা পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি। আর চেতনাহীনতার মাত্রা এর চেয়েও অধিক হলে জুম'আর দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রোববার দিন সাপ্তাহিক ছুটি চালু করা হয়। মুস্তাফা কামাল তুরস্কে এ কাজটিই করেছেন।

১৭. অর্থাৎ নিজেদের কাজ–কর্ম ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)।

১৮. কুরআন মজীদে বেশ কিছু সংখ্যক জায়গায় একটি হিদায়াত বা দিক নির্দেশনা, কিংবা একটি উপদেশ অথবা একটি নির্দেশ দেয়ার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (হয়তো তোমরা সফল হবে, কল্যাণ লাভ করবে) এবং لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (হয়ত তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে) বলা হয়েছে। এসব স্থানে "হয়ত" বা "সম্ভবত" শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলার (মা'আযাল্লাহ্‌) কোন সন্দেহ আছে। মূল ব্যাপার তা নয়। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনাভঙ্গি। এটা ঠিক তেমন যেন কোন দয়ালু মনিব তাঁর কর্মচারীকে বলছেন, তুমি অমুক কাজটি করো, হয়তো তোমার পদোন্নতি

হবে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি থাকে যার আশায় কর্মচারীটি মনযোগ দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ঐ কাজটি আঞ্জাম দিতে থাকে। কোন বাদশাহর মুখ থেকে তার কোন কর্মচারীর উদ্দেশ্যে একথা উচ্চারিত হলে তার ঘরে খুশীর বন্যা বয়ে যায়।

এখানে যেহেতু জুম'আর নামাযের হুকুম–আহকাম বর্ণনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং ইসলামের সাধারণ মূলনীতির আলোকে চারটি ফিক্‌হী মাযহাবে জুম'আর নামায সম্পর্কে যেসব হুকুম–আহকাম বের করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

হানাফী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। জুম'আ এ সময়ের পূর্বেও পড়া যেতে পারে না, পরেও পড়া যেতে পারে না। প্রথম আযানের সময় থেকেই কেনা–বেচা হারাম হয়ে যায়, —ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর দ্বিতীয় আযান দেয়ার সময় থেকে নয়। কারণ, কুরআনে শুধু اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة কথাটি বলা হয়েছে। তাই সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর যখন জুম'আর সময় শুরু হয় তখন জুম'আর নামাযের যে আযানটিই দেয়া হোক না কেন তা শোনার পর লোকদের কেনা–বেচা বন্ধ করে দেয়া কর্তব্য। তবে সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ক্রয়–বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বিক্রয় অবৈধ বা বাতিল হবে না, বরং তা কেবল একটি গোনাহর কাজ হবে। জুম'আর নামায প্রতিটি জনপদেই অনুষ্ঠিত হবে না, বরং শুধু مصر جامع "মিসরে জামে"–তে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা অনুসারে 'মিসরে জামে' বলা হয় এমন শহরকে যেখানে বাজার আছে, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে এবং তার জনবসতিও এত যে, যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয তারা সবাই যদি ঐ শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে স্থান সংকুলান হবে না। যেসব লোক শহরের বাইরে বসবাস করেন তাদের জন্য শহরে এসে জুম'আর নামায পড়া কেবল তখনই ফরয যখন আযানের শব্দ তারা শুনতে পাবে কিংবা খুব বেশী হলে শহর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হবে। নামায মসজিদেই হতে হবে তা জরুরী নয়। নামায খোলা মাঠেও হতে পারে। এমন মাঠেও জুম'আর নামায হতে পারে যা শহরের বাইরে অবস্থিত হলেও মূল শহরের একটি অংশ বলে বিবেচিত। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির শরীক হওয়ার সাধারণ অনুমতি আছে শুধু সেখানেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন বন্ধ জায়গায় যত মানুষই একত্রিত হোক না কেন, সেখানে সবারই আসার অনুমতি না থাকলে, জুম'আ সহীহ হবে না। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামায়াতে [আবু হানীফার (র) মতে] ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন অথবা [আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের মতে] ইমাম সহ দুইজন এমন লোক থাকতে হবে যাদের ওপর জুম'আ ফরয। যেসব ওজর থাকলে জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা, অথবা এমন রুগ্ন হওয়া যে, নিজে হেঁটে মসজিদে আসার ক্ষমা নেই। অথবা দু'টি পা–ই অক্ষম অথবা অন্ধ, (কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের (র) মতে অন্ধ ব্যক্তি কেবল তখনই জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাবে যখন তাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন লোক পাবে না)। অথবা কোন অত্যাচারীর পক্ষ থেকে তার জীবন ও মান–ইজ্জতহানির কিংবা সহ্যসীমা বহির্ভূত আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা কাদা পানি থাকে অথবা যদি সে বন্দী থাকে।

কয়েদী ও অক্ষমদের জন্য জুম'আর দিনে যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। যারা জুম'আর নামায পায়নি তাদের জন্যও যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। খোতবা জুম'আ সহীহ হওয়ার একটি শর্ত। কারণ, নবী কখনো খোতবা ছাড়া জুম'আর নামায পড়েননি। আর খোতবা অবশ্যই দু'টি হতে হবে এবং নামাযের আগে হতে হবে। ব্যক্তি যে স্থানে বসে আছে সে স্থান পর্যন্ত আওয়াজ পৌছুক আর না পৌছুক খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন তখন থেকে খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবরকম কথাবার্তা নিষিদ্ধ। এই সময় নামাযও না পড়া উচিত। (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, উমদাতুল কারী)।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। যখন দ্বিতীয় আযান (অর্থাৎ ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর যে আযান দেয়া) হবে তখন থেকে কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এ সময় কেনা-বেচা করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। এমন প্রত্যেকটি জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারবে যেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪০ জন লোক এমন আছে যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। জনপদের বাইরের যেসব এলাকার লোক আযান শুনতে পায় তাদের জন্য জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনবসতির অভ্যন্তরেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে জরুরী নয় যে, তা মসজিদেই পড়তে হবে। যারা মরু ভূমির মধ্যে তাঁবুতে অবস্থান করে তাদের ওপরে জুম'আ ফরয নয়। জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আ ফরয ইমাম সহ কমপক্ষে এ রকম ৪০ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। যেসব ওজর থাকার কারণে কোন ব্যক্তি জুম'আর নামায পড়া থেকে অব্যাহতি লাভ করে তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা কোন স্থানে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা করা, তবে সফর বৈধ হতে হবে। এমন বৃদ্ধ বা রুগ্ন যে সওয়ারীতে চড়েও জুম'আয় হাজির হতে অক্ষম। অন্ধ হওয়া এবং তাকে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক না পাওয়া। প্রাণ, সম্পত্তি অথবা মান-ইজ্জতহানির আশংকা থাকা। বন্দী অবস্থায় থাকা। তবে এই বন্দিদশা তার নিজের কোন অপরাধের কারণে না হওয়া। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা থাকতে হবে। খোতবার সময় চুপচাপ থাকা সুন্নাত, তবে কথা বলা হারাম নয়। যে ব্যক্তি ইমামের এতটা কাছে বসেছে যে, খোতবা শুনতে পায় তার জন্য কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে সে সালামের জবাব দিতে পারে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের উল্লেখ শুনে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

মালেকী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় হচ্ছে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর থেকে শুরু করে মাগরিবের এতটা পূর্ব পর্যন্ত যেন সূর্যাস্তের আগেই খোতবা ও নামায শেষ হয়ে যায়। কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হয় দ্বিতীয় আযান থেকে। এ সময়ের পর কোন কেনা-বেচা হলে তা অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল সেই সব জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেখানকার অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবে সেখানে বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করছে। শীত গ্রীষ্মে তারা অন্য কোন স্থানে চলে যায়

না। তারা ঐ জনপদেই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অস্থায়ী অবস্থানস্থলে যত লোকই থাক না কেন এবং তারা যতদিনই অবস্থান করুক না কেন সেখানে জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে না যে জনপদে জুম'আ অনুষ্ঠিত হয় তার তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ওপর জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া ফরয। জুম'আর নামায কেবল এমন সব মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতে পারে যা জনপদের ভিতরে বা সংলগ্নস্থানে অবস্থিত হবে এবং যার ইমারত জনপদের সাধারণ অধিবাসীদের ঘরের চেয়ে নিম্নমানের হবে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন মালেকী ফিকাহবিদ এরূপ শর্তও আরোপ করেছেন যে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হতে হবে এবং তাতে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু মালেকী মাযহাবের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলো, জুম'আ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। এমন মসজিদেও জুম'আর নামায হতে পারে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা নেই—যা কেবল জুম'আর নামায পড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয ইমাম ছাড়া কমপক্ষে এ রকম ১২ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা জরুরী। যেসব ওজর বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর থেকে জুম'আর নামায পড়ার নির্দেশ রহিত হয়ে যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা সফর অবস্থায় কোন স্থানে চারদিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করা। এমন রুগ্ন হওয়া যে, তার পক্ষে মসজিদে আসাই অসম্ভব। মা অথবা বাপ অথবা স্ত্রী অথবা সন্তান রুগ্ন ও অসুস্থ থাকা অথবা সে এমন কোন অপরিচিত রোগীর সেবা যত্ন করছে যার সেবা যত্ন করার মত আর কেউ নেই, অথবা তার কোন নিকটাত্মীয় কঠিন রোগে আক্রান্ত অথবা মরণাপন্ন। যে সম্পদের ক্ষতি সে বরদাশত করতে অক্ষম এমন সম্পদের ক্ষতির আশংকা থাকা। অথবা মারপিট ও বন্দীত্বের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাকে মজলুম বা অত্যাচারিতের পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা পানি থাকা কিংবা প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা মসজিদ পর্যন্ত যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি খোতবা যদি নামাযের পরে দেয়া হয় তাহলে নামায পুনরায় পড়া জরুরী। খোতবা মসজিদের ভিতরে হতে হবে। খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন সেই সময় নফল নামায পাড়া হারাম এবং খোতবা শুরু হলে তা শোনা না গেলেও কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে খতীব যদি খোতবা বহির্ভূত কোন বাজে বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন অথবা গালির উপযুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে গালি দেন, অথবা এমন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন যার প্রশংসা করা জায়েয নয়, অথবা খোতবার সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছু পড়তে শুরু করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার লোকজনের আছে। তাছাড়া জীবনের আশংকা না থাকলে বর্তমান বাদশাহ বা শাসকের জন্য খোতবার মধ্যে দোয়া করাও মাকরূহ। যিনি নামায পড়াবেন তাঁকেই খোতবা দিতে হবে। খতীব ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ালে সে নামায বাতিল হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্ শারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

হাম্বলী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় সকাল বেলা সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠার পর থেকে আসরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١﴾

আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে[১৯] সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।[২০] আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[২১]

আগে জুম'আর নামায পড়া শুধু জায়েয এবং পরে ওয়াজিব ও উত্তম। দ্বিতীয় আযান থেকে কেনা-বেচা হারাম এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনা-বেচা হলে তা কেনা-বেচা হয়েছে বলে ধরা হবে না। যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয এমন ৪০ জন লোক যে স্থানে আছে কেবল সেখানেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এসব লোকের স্থায়ীভাবে বাড়ীঘরে (তাঁবুতে নয়) বসবাসকারী হতে হবে। অর্থাৎ শীত বা গ্রীষ্মকালে তারা কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। এ জন্য জনবসতির বাড়ী ঘর ও মহল্লাসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন হোক তাতে কোন পার্থক্য হয় না। এই জনপদের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার দূরত্ব কয়েক মাইল হলেও যদি তা সমষ্টিগতভাবে একটি নামে পরিচিত হয় তাহলে তা একটি জনপদ বলেই গণ্য হবে। এ ধরনের জনপদ থেকে যারা তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাস করে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়তে মসজিদে আসা ফরয। জামায়াতে ইমাম সহ ৪০ ব্যক্তির উপস্থিত থাকা জরুরী। নামায মসজিদেই হতে হবে এমনটা জরুরী নয়। বরং খোলা মাঠেও নামায হতে পারে। যেসব কারণ বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর জুম'আর নামায আর ফরয থাকে না তা হচ্ছে ঃ মুসাফির হওয়া, যে জনপদের লোকদের ওপর জুম'আ ফরয এমন জনপদে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থানের ইচ্ছা করা, এমন রুগ্ন হওয়া যে সওয়ারীতে উঠে মসজিদে আসাও অসম্ভব, অন্ধ হওয়া—তবে সে নিজে যদি পথ হাতড়িয়ে আসতে পারে তাহলে আসবে। অন্য কোন লোকের সাহায্য নিয়ে অন্ধ ব্যক্তির জন্য মসজিদে আসা ওয়াজিব নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা নামাযের স্থানে পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হওয়া। কোন জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করে থাকা। প্রাণ ও মান-ইজ্জতহানির আশংকা কিংবা এমন আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকা যা বরদাশত করা যাবে না। নামাযের আগে দু'টি খোতবা হতে হবে। খতীবের কথা শোনা যায়, যে ব্যক্তি খতীবের এতটা নিকটে আছে খোতবার সময় তাঁর জন্য কথাবার্তা বলা হারাম। তবে দূরে অবস্থিত লোক যার কাছে খতীবের আওয়াজ পৌঁছে না সে কথাবার্তা বলতে পারে। খতীব ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক খোতবার সময় সবার চুপচাপ থাকা উচিত। জুম'আর দিনে ঈদ হলে যারা ঈদের নামায পড়বে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়া ফরয নয়। এ বিষয়ে হাম্বলী মযহাবের মত তিন ইমামের মত থেকে ভিন্ন (গায়াতুল মুনতাহা, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

যে ব্যক্তির ওপর জুম'আ ফরয নয় সে যদি জুম'আর নামাযে শরীক হয় তাহলে তার নামায সহীহ হবে এবং তার ওপর যোহরের নামায আর ফরয থাকবে না। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

১৯. যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জুম'আর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এটিই সেই ঘটনা। হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু মালেক এবং হযরত হাসান বসরী, ইবনে যায়েদ, কাতাদা এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে ঘটনার যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ পবিত্র মদীনা নগরীতে সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ঠিক জুম'আর নামাযের সময়ে এসে পৌছলো এবং জনপদের লোকজন যাতে তাদের আগমনের খবর জানতে পারে সেজন্য ঢোল-বাদ্য বাজাতে শুরু করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় খোতবা দিচ্ছিলেন। ঢোল ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনে সব মানুষ অস্থির হয়ে উঠল এবং ১২ জন লোক ছাড়া সবাই 'বাকী' নামক স্থানে ছুঁটে গেল। বাণিজ্য কাফেলা এখানেই অবস্থান করছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এর মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনাটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এ বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু উওয়ানা, আব্দ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য শুধু এতটুকু যে, কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঘটনাটি নামাযরত অবস্থায় ঘটেছিল। আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) যখন খোতবা দিচ্ছিলেন ঘটনাটি তখন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত জাবের এবং অন্য সব সাহাবী ও তাবেয়ীদের সবগুলো বর্ণনা একসাথে বিচার করলে যে কথাটি সঠিক বলে মনে হয় তাহলো ঘটনাটি খোতবার সময় সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে তিনি বলেছেন যে, ঘটনাটি জুম'আর নামাযের সময় ঘটেছিল সেখানে তিনি 'জুম'আর নামায' বলতে খোতবা ও নামায উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সে সময় ১২ জন পুরুষের সাথে সাত জন মহিলাও রয়ে গিয়েছিলেন। (ইবনে মারদুইয়া) কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, ১২ জন পুরুষের সাথে ১ জন মহিলাও ছিলেন (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)। দারুকুতনীর একটি রেওয়ায়াতে ৪০ ব্যক্তি এবং আব্দ ইবনে হুমায়েদের রেওয়ায়াতে ৭ জনের কথা বলা হয়েছে। ফাররা, আটজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলো সবই দুর্বল রেওয়ায়াত। কাতাদার এ রেওয়ায়াতও দুর্বল যে, এ ধরনের ঘটনা তিনবার ঘটেছিল (ইবনে জারীর)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতটিই নির্ভরযোগ্য। এতে মসজিদে থেকে যাওয়া লোকের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। আর কাতাদার একটি রেওয়ায়াত ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনাসমূহ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছে। মসজিদে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রে বিচার করলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা)। ইবনে ইয়াসির, হুযায়ফার আযাদ কৃতদাস হযরত সালেম (রা) এবং হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ। হাফেস আবু ইয়া'লা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে।

লোকজন যখন এভাবে বের হয়ে চলে গেল এবং মাত্র ১২ জন অবশিষ্ট থাকলেন তখন নবী (সা) তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ اَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِىْ نَارًا -

"তোমরা সবাই যদি চলে যেতে এবং একজনও অবশিষ্ট না থাকত তাহলে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হয়ে যেত।"

ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর কাতাদা থেকে প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শিয়াগণ এ ঘটনাটিকেও সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষ করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এত বিপুল সংখ্যক সাহাবীর খোতবা এবং নামায ছেড়ে ব্যবসায়–বাণিজ্য ও খেল তামাশার দিকে ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু এটি এমন একটি কঠোর অমূলক দোষারোপ যা শুধু বাস্তব থেকে চোখ বন্ধ করেই করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের অব্যবহিত পরে। সে সময় একদিকে সাহাবীদের সামষ্টিক প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যদিকে মক্কার কাফেররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা মদীনার অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করে রেখেছিল যার কারণে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসান বসরী বলেন, সেই সময় মদীনায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া (ইবনে জারীর)। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মদীনায় একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে হাজির হলে নামাযরত লোকজন এই ভেবে আশংকাবোধ করলো, আমরা নামায শেষ করতে করতে সব জিনিসপত্র বিক্রি না হয়ে যায়। এই ভয়ে তারা সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। এটা ছিল এমন একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ও কঠোর পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে সেই সময় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে এসব সাহাবী ইসলামের জন্য যেসব কুরবানী ও ত্যাগ–তিতিক্ষা দেখিয়েছেন তা যদি কেউ দেখে এবং ইবাদাত–বন্দেগী ও সামষ্টিক কাজ–কর্মে তাঁদের জীবন যে অতুলনীয় আল্লাহভীতির সাক্ষ দেয় তাও দেখে তাহলে সে একথা বলে তাদের ওপর দোষারোপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাধি ছিল। তবে তার নিজের হৃদয় মনে যদি সাহাবীদের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষের ব্যাধি থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

এ ঘটনা সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষকারীদের যেমন সমর্থন করে না তেমনি সেসব লোকের ধ্যান–ধারণার প্রতিও সমর্থন জানায় না যারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধার আতিশয্যে দাবী করেন যে, তাদের দ্বারা কখনো কোন ভুল হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও কখনো তা উল্লেখ করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের ভুল–ত্রুটির উল্লেখ করা এবং তাকে ভুল–ত্রুটি বলা তাঁদের অপমান করার শামিল। এতে হৃদয় মনে তাদের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া তাঁদের ভুল–ত্রুটির উল্লেখ সেসব আয়াত ও হাদীসেরও পরিপন্থী যার মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর নিকট

প্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব কথা স্পষ্ট বাড়াবাড়ি। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল নেই। এখানে যে কেউ দেখতে পারেন, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর (রা) একটি দল কর্তৃক যে ত্রুটি হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা নিজে এখানে তাঁদের সেই ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এমন গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতকে পড়তে হবে। সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থে তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীস ও তাফসীরের সমস্ত গ্রন্থে সাহাবা কিরাম (রা) থেকে পরবর্তীকালের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষীগণ পর্যন্ত তাঁদের এই ত্রুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মন থেকে ঐ সব সাহাবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ ত্রুটির উল্লেখ করেছেন যা তিনি নিজেই মানুষের মনে কায়েম করতে চান? অথবা এর অর্থ কি এই যে, এসব অন্ধ ও গোঁড়া ভক্তগণ শরীয়াতের যে মাসয়ালাটি বলে থাকেন সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেয়ীগণ, মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণের সে মাসয়ালাটি জানা না থাকার কারণে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা উল্লেখ করেছেন? আর যারা সূরা জুম'আ পড়েন এবং তার তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাদের মন থেকে কি সত্যি সত্যিই সাহাবা কিরামের (রা) প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উধাও হয়ে গেছে? এ সব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয়, আর নেতিবাচক তো অবশ্যই হবে তাহলে সাহাবায়ে কিরামের (রা) মর্যাদার নামে কিছু লোক যেসব অনর্থক এবং বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম কোন আসমানী মাখলুক ছিলেন না। বরং এই পৃথিবীতে জন্মলাভকারী মানুষ ছিলেন। তারা যা কিছু হয়েছিলেন তা হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার গুণে। তাঁদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধরে। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ শিক্ষার যে নিয়ম-পদ্ধতি দেখতে পাই, তা হচ্ছে, যখনই তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যথাসময়ে সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং দুর্বলতার সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের একটি কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে। জুম'আর নামাযের এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বাণিজ্য কাফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটলে আল্লাহ তা'আলা সূরা জুম'আর এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল করে এ বিষয়ে সতর্ক করলেন এবং জুম'আর নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা অবহিত করলেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর অনেকগুলো খোতবায় লোকজনের মনে জুম'আ ফরয হওয়ার গুরুত্ব বদ্ধমূল করে দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জুম'আর নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিলেন। আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে এসব হিদায়াত ও নির্দেশনা স্পষ্টভাবে পেয়ে থাকি। আমরা এ বিষয়ে ১৫ নং টীকায় উল্লেখ করেছি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুম'আর দিন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, যে উত্তম পোশাক তার আছে তা পরিধান করা এবং যদি সম্ভব হয় সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) হযরত সালমান ফারসী বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যমত নিজেকে বেশী করে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, মাথায় তেল দেবে, ঘরে যে

খোশবুই থাক না কেন ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই জন মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে বসবে না, তারপর আল্লাহর দেয়া সামর্থ অনুসারে নামায (নফল) পড়বে এবং ইমাম যখন খোতবা দিবেন তখন চুপ থাকবে, এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার কৃত অপরাধসমূহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত নুবাইশাতুল হুযালী (রা)–ও তাঁদের বর্ণনায় নবী (সা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ইমাম যখন খোতবা দেন, তখন যে ব্যক্তি কথা বলে সে এমন গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলে ঃ চুপ কর তারও কোন জুম'আ হয়নি (মুসনাদে আহমদ) হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ জুম'আর দিন খোতবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে তাকে যদি তোমরা বলো, "চুপ কর" তাহলে তোমরাও অর্থহীন কাজ করলে (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও তাবারানী হযরত আলী (রা) ও হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে নবী (সা) খতীবদেরকেও দীর্ঘ খোতবা দিয়ে মানুষকে বিরক্ত ও অতিষ্ট না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে জুম'আর দিন সংক্ষিপ্ত খোতবা দিতেন এবং নামাযও খুব দীর্ঘ করে পড়াতেন না। হযরত জাবের (রা) ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) খোতবা দীর্ঘায়িত করতেন না। তাঁর খোতবা হতো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার সমষ্টি (আবু দাউদ)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা নামাযের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতো এবং নামায খোতবার চেয়ে দীর্ঘ হতো (নাসায়ী)। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে সে দীনের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)। বায্যার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) লোকজনকে কিভাবে জুম'আর নামাযের নিয়ম–কানুন ও আদব–কায়দা শিখাতেন এসব হাদীসের ভাষ্য থেকে তা অনুমান করা যায়। এভাবে এ নামাযের এমন একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নজীর পৃথিবীর কোন জাতির সামষ্টিক ইবাদাতে দেখা যায় না।

২০. সাহাবীদের যে ত্রুটি হয়েছিল তা কি ধরনের ত্রুটি ছিল এ আয়াতাংশ থেকে তা বুঝা যায় (নাউযুবিল্লাহ)। যদি ঈমানের দুর্বলতা ও জেনে শুনে আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া এর কারণ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, শাসানি এবং তিরষ্কারের ধরন হতো ভিন্ন। কিন্তু এ ধরনের কোন অপরাধ যেহেতু সেখানে হয়নি, বরং যা হয়েছিল তা প্রশিক্ষণের অভাবে হয়েছিল। তাই প্রথমে শিক্ষকসুলভ ভঙ্গিতে জুম'আর নিয়ম–কানুন ও আদব–কায়দা শেখানো হয়েছে। তারপর তাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে মুরুব্বিয়ানাভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, জুম'আর খোতবা শোনা এবং নামায পড়ার জন্য আল্লাহর নিকট থেকে তোমরা যা লাভ করবে তা এই দুনিয়ার ব্যবসায়–বাণিজ্য ও খেল তামাশার চেয়ে উত্তম।

২১. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যকস্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তা'আলাকে احسن الخالقين "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা", কোথাও خير الغافرين "সর্বোত্তম ক্ষমাকারী", কোথাও خير الحاكمين "সর্বোত্তম বিচারক", خير الراحمين কোথাও "সর্বোত্তম দয়ালু" এবং কোথাও خير الناصرين "সর্বোত্তম সাহায্যকারী" বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী।